শিক্ষা সমাজ দেশ

গন্তব্যটা আগে খুঁজি ও বুঝি, তারপর সাধু সাজি

(প্রকাশিত শিরোনাম: গন্তব্যটা ঠিক করা যাচ্ছে না)

–ড. হাসনান আহমেদ

কয়েকদিন থেকেই লালনের এ গানটা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে: 'জাত গেল জাত গেল বলে, একি আযব কারখানা! সত্য কাজে কেউ নাই রাজি, সবি দেখি তা-না-না-না; জাত গেল জাত গেল...'। রাজনীতির উদ্দেশ্য, রাজনীতিকদের কার্যাবলী ও দায়িত্ব, যা পৌরনীতি বইতে প্রথমেই শিখেছিলাম, তা এ কলিযুগে ভুলতে বসেছি। এসব পুস্তকী কথাবার্তা এদেশের রাজনীতিকরাও হয়তো ভুলে গেছেন। মনকে প্রবোধ দিতে পারি না বলেই লিখি। রাজনীতিকদের প্রধান কাজ হলো দেশের কল্যাণে কাজ করা, দেশের উন্নতি করা, জনগণের মঙ্গল নিয়ে ভাবা ও সেমতো সবকিছু করা। বাস্তবে বইতে লেখা কথার সঙ্গে কাজ ও ভাবনার কোনো মিলই নেই, ধান্ধা ভিন্ন। বর্তমানে রাজনীতিও একটা অতি লাভজনক ব্যবসার নাম; রাজনীতির নামে ব্যবসা। এদেশে চমৎকার মানিয়ে গেছে। এ কথা কে না জানে! বলতে গেলেই যত অসুবিধা।

অন্তবর্তী সরকার অনেক সংস্কারের চেষ্টা করছে; কিন্তু আমাদের এ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের বিপরীত কর্ম নিয়ে ভাবছে না কেন? সংস্কারের সব দফাগুলো পড়েছি। আমরা রোগ নিরাময়ে রোগের কারণ নির্ণয় করছি কম; অনেক ক্ষেত্রে অযথা এন্টিবায়টিকের পরিবর্তে মলম মালিশ করছি বেশি। দেশের কর্মপদ্ধতির কিছু পরিবর্তন তো হবেই, বিভিন্ন পদের পরিবর্তন হবে। তাতেই যতটা লাভ হয়। মূলত দেখা দরকার, অধুনা আবিস্কৃত রাজনৈতিক ব্যবসার ধন্বন্তরি নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা শক্তভাবে প্রতিষ্ঠা করছি কিনা? দেশের নিয়ম-কানুন ও মানুষকে সঠিক ও উপযুক্ত ট্র্যাকে ফিরিয়ে আনতে পারছি কিনা। 'মহান রাজনীতিক'দের রাজনীতির ব্যবসা ও স্বভাবের কোনো পরিবর্তন হবে কিনা? এখন দেশের টাকা ব্যক্তির পকেটে ঢুকে পাচার হয়ে যাচ্ছে না, তাই সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার কারণে '২৪-'২৫ সালে দুর্ভিক্ষ এড়ানো সম্ভব হলো। এভাবে আমাদের ভাবার অভ্যাস নেই। তবে দেশের বিভিন্ন অফিসে অবৈধ টাকা লেনাদেনা একটুও কমেনি। সংস্কারের ফলে এটা কি কমবে? সমাজের মানুষের ও রাজনীতিকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের তো কোনো বদল হবে বলে মনে হচ্ছে না। কোনো ভালো-সুশিক্ষিত লোকও তো হাজামজার পরিবর্তে রাজনীতিতে নতুন এলো না। তাহলে দেশের কীভাবে উপকার সম্ভব? যত চোর-ডাকাত-ভাওতাবাজ সবাই কি তপস্বী-দরবেশ হয়ে যাবে? যত সংস্কারই করি দেশব্যাপী দুর্নীতির যে মচ্ছব অপেন-সিক্রেট রেওয়াজ আকারে শুরু হয়েছে, এর কোনো পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থের জায়গা থেকে নট নড়ন-চড়ন। জানি, নেতিবাচক কথা বেশি বলছি। লালন অন্য একটা গানে বলেছিলেন, 'পাবে সামান্যে কি তার দেখা, বেদে নাই যার রূপরেখা ওরে...'। নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও অসুবিধা হচ্ছে। দুর্নীতির মতো মরণঘাতি ব্যাধি ইচ্ছে করলে আমরা সম্পূর্ণ না পারলেও অন্তত সত্তর ভাগ নিরাময় করতে পারি। কিন্তু সে সম্পর্কীত সিস্টেম সংস্কার কই? ইনিয়ে-বিনিয়ে যত কথাই বলি, এ রোগের উপশমটাই দেশের মূল লাভ।

তিক্ত কথাটা হলো, ব্যবসার রাজনীতিতে বিঘ্ন ঘটে এমন কোনো সংস্কার 'মহান রাজনীতিকরা' করার ইচ্ছে করলে তো! এক্ষেত্রে তাদের কথিত দেশ-কল্যাণের কোনো প্রস্তাব বা রাজনীতিতে নীতি-নৈতিকতার উন্নতি হয় এমন সংস্কার নিজেরা একজোট হয়ে ধৈর্য ধরে করিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে তারা নির্বিকার। শেষে পকেটভারী-কর্মীপোষার পথ বন্ধ হয়ে যায়! তা কি মেনে নেওয়া যায়? এদেশের রাজনীতিতে, এমনকি সমাজেও সততা, নীতি-নৈতিকতা শব্দটা উচ্চারিত হতে কম শোনা যায়। আবার দেশের উন্নতি চাই। বিপরিতমুখী প্রত্যাশা নয় কি? সংস্কারে সংসদের আসনে অনেক পদ বেড়ে যাবার সম্ভাবনা। নোমিনেশন ফরম বিক্রির অপ্রকাশিত ব্যবসারও তো বিস্তার

ঘটবে, আশা করা যায়। বেশ কয়েক বছর আগে 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল' তথ্য প্রকাশ করেছিল, সংসদের অধিকাংশ এমপি দুর্নীতিবাজ। তবে উচ্চ-কক্ষে ও নিম্ন-কক্ষে পদের সংখ্যা বাড়লে দুর্নীতি বাড়বে, নাকি কমবে অনুমান করা যায়। এমপি মহোদয়দের দায়িত্ব কি শুধু আইন তৈরির মধ্যে ও সংসদের গণ্ডির মধ্যে রাখা যায় না? নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে সরকারের উন্নয়নমূলক সব কাজের তদারকী ও টাকার গন্ধ শোকা ছাড়াও এলাকায় যত সমিতি আছে, যেমন– মুরগির খামার সমিতি, ইটভাটা সমিতি, নেশা প্রতিরোধ সমিতি, গাঁজাখোর সমিতি ইত্যাদি শতেক জায়গা থেকে পকেট-ভারীর অভ্যাস কোনো-না-কোনো সংস্কারের মাধ্যমে নিরোধ করা যায় কিনা? এগুলোই মূলত সময়ের দাবি। সবাই মিলে-মিশে পাঁচ বছরের জন্য একটা জাতীয় সরকার গঠন করতে পারলে অনেক সমস্যার সমাধান হতো।

দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে আমার একটা সোজাসাপটা সংস্কার প্রস্তাব আছে। অগনিত রাজনৈতিক দলের এই অভিনব দেশে সম্ভবত কেউ এ প্রস্তাব আমলে নেবে না। প্রতিটা রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের এলাকাভিত্তিক তালিকা তারা নিজে তৈরি করবে। প্রতিটা উপজেলায় তাদের নেতার হাতে একটা তালিকা থাকবে। কেন্দ্রের দলীয় অফিসেও সক্রিয় নেতা-কর্মীদের তালিকা থাকবে। রাষ্ট্রপ্রধানের অফিসেও প্রতিটা দলের নেতা-কর্মীদের আলাদা তালিকা থাকবে। দেশের যে কোনো জায়গায় কোনো নেতা-কর্মী আইনবিরোধী, নীতিবিরোধী বা দেশবিরোধী কিছু করলে তাকে লোক-দেখানো নামমাত্র দল থেকে বহিস্কার করলেই হবে না; চিরদিনের জন্য বহিস্কার করতে হবে। অপরাধীকে দলীয়ভাবে আইনের হাতে সোপর্দ করতে হবে। এটা তখনই সম্ভব, যখন কেন্দ্রীয় নেতাদের রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি শ্রদ্ধা থাকবে। দেশের রাজনীতির চরিত্র নিয়ন্ত্রণ মানে সরকারি সব বিভাগ, উপ-বিভাগ, অবৈধ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সবই অতি অল্প সময়ে নিয়ন্ত্রণ হয়ে যাওয়া। এত ছোট্ট একটা দেশ, অবৈধ কর্মকাণ্ডের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ করা আদৌ কঠিন কিছু নয়। টেকনোলজির এই যুগে প্রতিটা ক্ষেত্রেই অসংখ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্থাপন করা যায়। এমন কোনো কম্পিউটার যদি আবিষ্কার করা যেত, মানুষের বাইরের কথা ও মনের কথা একসাথে দেখা যেত! ইচ্ছে যদি থাকে, রাজনীতির ক্ষমতা খাটিয়ে ব্যবসা করে সম্পদের মালিক হবো, এদেশে এর যথেষ্ট সুযোগ আছে; মহান কেন্দ্রীয় নেতারা তখন বুঝেও না বোঝার ভান করেন। নইলে যে রাজনীতি করতে দলে লোক পাওয়া যায় না। দুর্নীতির আরো নতুন নতুন পথ বিগত পতিত সরকার প্রশিক্ষণ দিয়ে হাতে-কলমে শিখিয়ে গেছে। এখন শুধু চর্চার অপেক্ষায়। সুযোগসন্ধানী লোকের এ সমাজে অভাব নেই; অজুহাত ও প্যাচের কথারও অভাব নেই। অভাব কর্মঠ-সৎ ও দায়িত্বশীল দেশ ও সমাজসেবকের। অভাব প্রতিনিধিত্বের জবাবদিহিতার। নির্বাচন হলেই দেশ উন্নতির শিখরে উঠে আহ্লাদে দোল খেতে থাকবে, তা নয়। এসব ভেবেই লালন গেয়েছিলেন, 'জানি ম'লে পাবে বেহেশতখানা, আসলে তো মন মানে না; বাকির আশায় নগদ পাওনা, কে ছাড়ে এ ভূবনে! সহজ মানুষ...'। রাজনীতিকদের সদিচ্ছা থাকলে চব্বিশের এই আধা-সমাপ্ত বিপ্লবকে কাজে লাগিয়েও দেশের অনেক উন্নতি করা যেত, ভবিষ্যত উন্নতির পেক্ষাপট গড়তে পারতো। মূলত পরিণামে তা কিন্তু হবে না। 'উঠন্তি মূলো পত্তনেই চেনা যায়'। বিভিন্ন পক্ষকে দোষারোপ করে, পানি ঘোলা করে পরিবেশের জগাখিচুড়ি পাকিয়ে ফেলবে। এটা আমাদের মজ্জাগত ব্যাধি। লাভবান হবে প্রতিপক্ষ, যারা এদেশের মঙ্গল চায় না। বিষয়টা অনেক ভেবে দেখেছি। কার্যত রাজনীতিকদের মানসিকতা বিকৃত ও নষ্ট হয়ে গেছে। এ বিষয়টা নিয়ে সংস্কার কমিটির ভাবতে হবে।

(২৪/৪/'২৫, যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশ)

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদঃ সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
ওয়েব পেজঃ pathorekhahasnan.com